মূলপাতা

হেফাযত ইসলাম: শাপলা ও শোকরানা

Asif Adnan

May 5, 2019

7 MIN READ

অন্য আরো অনেকের মতো হেফাযত নামটার সাথে আমার পরিচয়ও ২০১৩ এর ফেব্রুয়ারিতে। বাংলাদেশের সমাজের এ অংশটার ব্যাপারে এর আগে কোন ধারণা আমার ছিল না। শ্রেণীগতভাবে আমি সমাজের ঐ অংশের ছিলাম যাদের বেশিরভাগ মাদ্রাসার ছাত্রশিক্ষকদের তাচ্ছিল্য করে 'মোল্লা' বলে। তবে তাচ্ছিল্য না ব্যক্তিগতভাবে আমার না জানার কারণ ছিল অনিচ্ছা - কখনো জানার ইচ্ছা ছিল না, প্রয়োজন মনে করিনি, চেষ্টাও করিনি। ২০১৩ এর ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে মে পর্যন্ত সময়টা আমার জন্য ছিল একটা এক্সিসটেনশিয়াল ক্রাইসিসের মতো। এসময়টাতে আমি যা ছিলাম সেটাকে খুব টেনেটুনেও ভালো মুসলিম বলা যায় না – আদৌ মুসলিম বলা যায় কি না – সেটাও আমি নিশ্চিত না - কিন্তু প্রথমত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সম্মানের প্রশ্ন এবং দ্বিতীয়ত হেফাযত ইসলামের আন্দোলন আমার চিন্তাকে শক্তভাবে নাড়া দিয়েছিল। হেফাযতে ইসলামের ১৩ দফা দাবি আমাকে বাধ্য করেছিল নিজেকে এমন কিছু প্রশ্ন করতে যেগুলোর কাছ থেকে অনেকদিন ধরে অনেকের মতোই আমিও পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। আরো নির্দিষ্ট করে বললে, আমার নিজেকে প্রশ্ন করার একটা ট্রিগার ছিল হেফাযত ইসলামের ১৩ দফা দাবির প্রতি শহুরে শিক্ষিত সমাজের – আমার সমাজের – প্রতিক্রিয়া। স্বেচ্ছায় চিন্তা বন্ধ করে রেখে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর ওপর বিশ্বাসের সাথে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্ঘর্ষের প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়ার অভ্যস্ততায় ব্যাঘাত ঘটলো।

হেফাযতের ১৩ দফা নিয়ে তখন তুমুল তর্কবিতর্ক। তেতুল তত্ত্ব নিয়ে গরম অনলাইন। আশেপাশের মানুষজন সমানে 'মোল্লা' আর 'হুজুরদের' শ্রাদ্ধ করছে। কিন্তু ১৩ দফা দাবি পড়ার পর আমি দুটো কথা স্বীকার করতে বাধ্য হলাম। এক. এই দাবিগুলো ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে 'উগ্র' বা 'কট্টর' কিছু নেই। বরং বলা যায় অনেক ক্ষেত্রে যতোটুকুবলা দরকার তার চেয়ে কম বলা হয়েছে। মুসলিম হিসেবে এগুলোর বিরোধিতা করার কোন সুযোগ আমার নেই। দুই. এই ১৩ দফায় উঠে আসা বেশ কিছু বিষয় এবং তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, এই দাবিগুলোর পেছনে যে মতাদর্শ আছে, সেটা আমার বর্তমান লাইফস্টাইলের সাথে সাংঘর্ষিক। আমরা সবাই তো নিজেকে মুসলিম বলি, কিন্তু মৌখিক পরিচয় আর আসলে ইসলাম মানা ও পালন করার পার্থক্যটা নিয়ে আমি সত্যিকারভাবে, নিজের সাথে সৎ হয়ে ভাবতে বাধ্য হলাম। আমি বাধ্য হলাম নিজের দ্বিমুখীতাকে স্বীকার করতে। পাশাপাশি আমি দেখলাম আমার নিজের ভেতরের এই সঙ্কট সত্ত্বেও, নিজেকে কোন একটা দিকে দাড় করাতে না পারলেও, হেফাযতের উত্থান আমাকে আনন্দিত করছে। আমি কাউকে চিনি না, জানি না, কিন্তু এমন কিছু মানুষ আছেন যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পক্ষে কথা বলবেন, ইসলামের প্রশ্নে শক্ত অবস্থান নেবেন – এটা চিন্তা করে ভালো লাগছে।

এপ্রিলে শাপলার চত্বরের মহাসমাবেশে গিয়েছিলাম। যারা কথা বলছেন তাঁদের কাউকে চিনি না। সাউন্ড সিস্টেমের মিক্সিং এতো বাজে যে কী বলা হচ্ছে তাও বুঝতে পারছি না। আশেপাশে যতোদূর তাকাই সবাই সাদা পাঞ্জাবী পড়া। চারপাশে 'আমার মতো' আর কাউকে দেখছি না। অস্বস্তি লাগছিলো। কিন্তু দায়িত্ব মনে হচ্ছিলো ওখানে থাকা। যদি শাহবাগে ওরা সবাই এভাবে জড়ো হয় তাহলে এতোগুলো মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য কষ্ট করে ঢাকা আসলো, আমি অস্বস্তি গিলে কিছুক্ষণ দাড়াতে পারবো না?

৫-৬ মে ছিল আমার জন্য একইসাথে সাইকোলজিকাল ট্রমা আর ট্র্যান্সফরমেটিভ এক্সপেরিয়েন্সের মতো। দুপুরে বেড়িয়েছিলাম, সন্ধ্যায় বাসায় ফিরতে ফিরতে পুরো এলাকা রীতিমতো রণক্ষেত্র। টিয়ার গ্যাসের জন্য চোখ খোলা যাচ্ছে না। ৯ তলার ওপরও মুখে কাপড় বেঁধে বন্ধ করে রাখতে হচ্ছে সব জানালা। তখন অভ্যাস ছিল প্রায় সারারাত জেগে থাকার। সারারাত 'মতিঝিলে কিছু না হওয়ার' শব্দ শুনলাম। সকালে জানলাম কোথাও কিছু হয়নি। 'হেফাযতিরা সোবানাল্লাহ বলতে বলতে পালিয়ে গেছে'। এরপরের অবস্থা অল্প কথায় গুছিয়ে লেখা কঠিন, তবে আমি এটুকু বুঝলাম 'কোথাও কিছু না ঘটলে'-ও আমার মনের মধ্যে কিছু একটা ঘটে গেছে। এই ঘটনাকে জাস্ট শ্রাগ করে আগের জীবনে ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না।

সম্ভবত এর কয়েকদিন পরেই ছিল অনার্সের ফেয়ারওয়েল। মনে হল আল্লাহ্ 'আয্যা ওয়া জাল সিদ্ধান্ত নেয়া আমার জন্য সহজ করে দিচ্ছেন। আমি হেফাযতের নেতাদের চিনি না, তাঁদের নিয়ে চিন্তিতও না – কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ মানুষ কেন এসেছিল? আল্লাহ্ রাসূল ﷺ এর অবমাননার বিচার চাইতে। সব অ্যানালাইসিসের পরও এটাই হল বাস্তবতা। আর তাঁদের সাথে যা হয়েছে কিংবা 'হয়নি' সেটার মূল কারণ ছিল, বিচারের দাবি, ১৩ দফা – ইসলাম। এ ঘটনার পর দু নৌকায় পা দিয়ে চলা যায় না। সব কিছু ভুলে গিয়ে ফেয়ারওয়েলে গিয়ে মৌজমাস্তি করা যায় না। এই সময়টাতেই আমি কনশাসলি ডিসিশান নিয়েছিলাম যে আমি এতোদিন যা করে এসেছি সেটা ভুল এবং আমি হয়তো পারবো না, কিন্তু আমার নিজেকে বদলানোর চেষ্টা করতে হবে।

ওপরে যে কথাগুলো বললাম সেগুলো অপ্রাসঙ্গিক এবং আলটিমেটলি মূল্যহীন, কারণ এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। ইতিহাসের মাপকাঠিতে এসব ব্যাক্তিগত কথা আর অভিজ্ঞতার তেমন কোন মূল্য নেই। তবুও এ কথাগুলো বললাম কারণ হেফাযতে ইসলামের ব্যাপারে আমার চিন্তা এই অভিজ্ঞতার সাথে জড়ানো। হেফাযতের ব্যাপারে আমার কোন রোমান্টিসিযম ছিল না। হেফাযত কী, আর কী না, এ নিয়ে কোন কালেই আমার কনফিউশান ছিল না। যুক্তির বিচারে তখন থেকেই জানি হেফাযতে ইসলাম কোন বিপ্লব আনবে না। হেফাযতে ইসলামের সাথে ছোটবড় অনেক বিষয়ে আমার মতপার্থক্যও আছে। কিন্তু তারপরও হেফাযতের প্রতি, হেফাযতের আইডিয়াটার প্রতি আমার একটা দুর্বলতা কাজ করে। হয়তো এর মধ্যে বায়াস আছে, থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখনো আর্মার্ড ভেহিকেলের সামনে সিজদারত মুসল্লির ছবি আমার চোখে ভাসে। সব ত্রুটিবিচ্যুতির পরও একেবারে বাইরে থেকে দেখা একজন দর্শক হিসেবে বলছি ২০১৩ তে হেফাযত যে ভূমিকা পালন করেছে সেটা ঐতিহাসিক। আমার মনে হয় ২০১৩ সালের ঘটনাগুলো শুধু আমার মতো আরো অনেক মানুষের জন্য ট্র্যান্সফরমেটিভ ছিল না, বরং এটা বাংলাদেশের জন্যও একটা ট্র্যান্সফরমেটিভ সময় ছিল। এর অনেক প্রমাণও আছে, তবে সেই আলোচনায় এখন গেলাম না।

মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্রকে সংশোধনের জন্য, তাদের সামনে দৃষ্টান্ত হবার জন্য, নেতৃত্ব নেয়ার জন্য Integrity এর প্রয়োজন – নৈতিক বিশুদ্ধতা আর আদর্শিক শক্তির প্রয়োজন। শত সমালোচনার পরও ১৩ তে হেফাযতের এই integrity ছিল। মানুষ সেটা সম্মান করেছিল। ১৩ এর হেফাযত আমার মতো অনেককে ভাবতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু গত ছ' বছরে দুঃখজনকভাবে ব্যাপারটা বদলে গেছে। গত অর্ধযুগের নানা ঘটন-অঘটনের পর এটুকুমনে হয় সবার কাছেই পরিষ্কার সমাজ ও রাষ্ট্রের সামনে বড় কোন পরিবর্তনে তারা আর নেতৃত্ব দিতে পারবেন না। তারা গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছেন। বিশেষ করে ২০১৮ এর ৪-ই নভেম্বরের পর। যেভাবে সাধারণ মানুষ ১৩ তে তাদের কথা নিয়েছিল, সেভাবে এখন আর নেবে না। অনেকে বলতে পারেন ২০১৩ ছিল হেফাযতের, ২০১৮ ছিল হায়াত আল উলইয়া-র। সেটা ছিল আন্দোলন, এটা ছিল অধিকার অর্জন, ইত্যাদি। আমার কাছে খুঁটিনাটি নিয়ে প্যাচানোর এ চেষ্টা অর্থহীন এবং কিছুটা অসৎ মনে হয়। যারা হেফাযতের নেতা, যারা আকাবীর, যারা মুরুব্বী, যারা বড় – তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে অথবা নিরব সমর্থনে ২০১৩ এবং ২০১৮ হয়েছে। তাই এ পার্থক্য নিয়ে তর্ক সেমেন্টিক্স নিয়ে একটা অপ্রাসঙ্গিক, অনর্থক তর্ক। দিনশেষে, রিয়েল টার্মসে বাস্তবতা হল এই যে সাধারন মানুষ দেখছে কওমি আলিমগণ, 'হেফাযতিরা' ১৩তে আর ১৮তে দু রকম চেহারা নিয়ে এসেছেন। সাধারণ মানুষ কওমি কিংবা দেওবন্দিয়াতের লেন্স দিয়ে বিচার করবে না, সে তার সাধারণ বোধবুদ্ধির ভিত্তিতে করবে।

২০১৩ এর মতো ২০১৮ এর ঘটনাও তাই ট্র্যান্সফরমেটিভ, কারণ যারা নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনার জন্য এই মুরব্বিদের দিকে তাকিয়েছিলেন এখন তাদের অনেকে নতুন করে চিন্তা করবেন। করতে হবে। বিশেষ করে কওমি অঙ্গনের জন্য একথাটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যারা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেন, যারা নিজের সাথে সৎ থাকতে চান – তাঁদের আসলেই গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে তারা আজকের ঘটনার ভার বহন করতে রাজি আছেন কি না। এবং এটাও মনে রাখতে হবে যে এটা কেবল শুরু। এটা বিশ্বাস করা সম্ভব না যে আল্লাহ্ রাসূল ﷺ এর ভালোবাসায় শাপলা চত্বরে ছুটে আসা সবাই আজ সবকিছু ভুলে গেছেন। নগ্ন আত্মবিক্রি আর উদগ্রীব হয়ে স্বেচ্ছায় অপমানিত হবার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত দেখার পরও শুধু দেওবন্দিয়্যাত, আকাবীর, কিংবা বড়-দের অজুহাত দিয়ে সবাইকে ভুলিয়ে রাখা যাবে এটাও বিশ্বাস করা কঠিন। হক উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোন পদবি না। আল্লাহ্র দ্বীন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিবর্গের মুখাপেক্ষী না। কওমি অঙ্গনের

যে বিশাল অংশ আজ অপমানিত ও ব্যাথিত হয়েছেন, তাদের আত্মজিজ্ঞাসার এক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। চিন্তা করতে হবে তারা কি এই স্রোতে গা ভাসাবেন? দারুল উলুম দেওবন্দ, সংখ্যাগরিষ্ঠতা, আহমাদ শফি কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ দলিল বানিয়ে আত্মপ্রতারণা করবেন নাকি আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত শরীয়তের আদলে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও করনীয় বেছে নেবেন? নিজেদের পরিচিত কমফোর্টে যোনের খোলসে আটকে থাকবেন নাকি অপ্রিয়, কঠিন কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলো নিজেদের করবেন? তারা কি 'কওমির' নাকি উম্মাহর- এই প্রশ্নের জবাবও খুঁজে নিতে হবে। এ ভূখণ্ডে গৌরবময় এ ধারার পরিণতি কী হবে, তা নির্ভর করবে এ প্রশ্নগুলোর উত্তরের ওপর। পরিণতি কী হবে আমি জানি না। তবে আমি জানি বান্দা যখন আল্লাহ্ 'আয্যা ওয়া জাল এর কাছে আন্তরিকভাবে পথে দিশা চায়, তখন তিনি নিরাশ করেন না।

কিছু জিনিস আগুনে পুড়ে যায়, কিছু জিনিস বিশুদ্ধ হয়।
যারা পুড়ে যাবার তারা পুড়ছে, পুড়ে গেছে। যারা বিশুদ্ধ হবার ইতিহাসের দাবি এখন তাঁদের কাছে।